সরকারি মহাপরিকল্পনা ২০১৬: জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এবং এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

মোশাহিদা সুলতানা

এই প্রবন্ধে সরকারের সর্বশেষ ২০১৬ সালে প্রকাশিত জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মাস্টারপ্ল্যানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনুসন্ধান করা হয়েছে যে, যে মহাপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা কি আদৌ বিদ্যুৎ সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য প্রণীত নাকি এই খাতকে দেশি-বিদেশি ব্যক্তি পুঁজির মুনাফা বর্ধনের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রথমে ২০১৬ বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার প্রধান কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো কিভাবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং শেষে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কী কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে এর ভিত্তিতে এই মহাপরিকল্পনা কী অর্থ বহন করে তার একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

২০১৬ এর জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান ২০১৬ এর একটি খসড়া। এটি তৈরি করেছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা), টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেড এবং টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানির সহায়তায়। নতুন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মহাপরিকল্পনা বা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান তৈরির উদ্দেশ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কী হওয়া উচিত তার দিকনির্দেশনা দেওয়া। জাপানি সংস্থা জাইকার সহযোগিতায় ২০১০ সালের মাস্টারপ্ল্যানের সঙ্গে সমন্বয় করে ২০৪১ সালকে লক্ষ্য ধরে নতুন মাস্টারপ্ল্যান করতে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। গত জুন মাসের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করলে ২০৪১ সাল নাগাদ দেশে বিদ্যুতের মোট চাহিদা দাঁড়াবে ৬৩ হাজার মেগাওয়াট। আর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়লে ১৩ হাজার মেগাওয়াট সাশ্রয় হয়ে তা ৫০ হাজার মেগাওয়াটে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় আরো বলা হয় যে পাশাপাশি গ্যাস ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর চাপ কমাতে কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হবে। ২০৪১ সাল নাগাদ ৭০ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করা হবে আমদানি করা এলএনজি থেকে। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আরো ৩ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়ানো হবে এবং আমদানি করা বিদ্যুতের পরিমাণ ৫০০ মেগাওয়াট থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে।

মাস্টারপ্ল্যানে উল্লেখিত জ্বালানিনির্ভরতার নতুন লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করলে পরিকল্পনার চিত্রটির একটি সামগ্রিক রূপ দেখা যায়। দেখা যায়, প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা ৫৭% থেকে কমিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে ৩৮%, জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরতা ১৭% থেকে বাড়িয়ে ২৫%, কয়লার ওপর নির্ভরতা ৩% থেকে বাড়িয়ে ২০%, নিউক্লিয়ার পাওয়ারের ওপর নির্ভরতা শূন্য থেকে বাড়িয়ে ৯%, জল, সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরতা প্রায় শূন্যের কোঠায় অপরিবর্তিত, বায়ো ফুয়েল ও বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানি ২৩% থেকে কমিয়ে ৩%, এবং রপ্তানি ১% থেকে বাড়িয়ে ৫% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১৬ মাস্টারপ্ল্যানে উল্লেখিত লক্ষ্যগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় পরস্পরবিরোধী। প্রথমত, এই মহাপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে তার একটি হলো পরিবেশ। দ্বিতীয়ত, ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তার পূর্বশর্ত শুধু জ্বালানি উৎপাদন নয়, বরং ভোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সস্তায় জ্বালানি সরবরাহ করা। কিন্তু ২০৪১ সাল নাগাদ যে ধরনের জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, যেমন নিউক্লিয়ার ও কয়লা, তা একদিক থেকে ব্যয়বহুল এবং অন্যদিক থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যেগুলোর খরচ দিনে দিনে কমে আসছে এবং পরিবেশবান্ধব হিসেবে সারা বিশ্বে গৃহীত হচ্ছে, সেগুলোর ব্যবহার ২০৪১ সাল নাগাদ মোট জ্বালানি উৎপাদনের শতকরা হিসাব অনুযায়ী প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মহাপরিকল্পনায় একটি হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে, বিদ্যুতের মূল্য প্রতিবছর ১০% করে বাড়লে প্রকৃত জিডিপি ০.৭২% হারে হ্রাস পাবে, ২০% করে বাড়লে ১.৪৫% হারে হ্রাস পাবে, এবং ৩০% হারে বাড়লে প্রকৃত জিডিপি ২.১৭% হারে হ্রাস পাবে (Survey on Power System Master Plan 2016, draft report, page 2-47)।

এই প্রবন্ধে ২০১৬ মাস্টারপ্ল্যানের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে এর মধ্যে উল্লেখিত পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলো কিভাবে ঐতিহাসিকভাবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত তথা বিদেশি পুঁজি ও শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রবন্ধ অনুসন্ধান করেছে সরকার যে মহাপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে তা কি আদৌ কোনো নতুন বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা, নাকি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে অব্যাহত নব্য উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের একটি অংশ। এই প্রবন্ধে প্রথমে ২০১৬ বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার প্রধান কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো কিভাবে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং শেষে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে

কী কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে এর ভিত্তিতে এই মহাপরিকল্পনা কী অর্থ বহন করে তার একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে।

২. বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা ২০১৬ অনুযায়ী গ্যাস খাত উন্নয়নের জন্য ২০১৯ সাল নাগাদ প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) সংশোধন করে 'আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর জন্য বিনিয়োগবান্ধব নতুন চুক্তি' করে টেন্ডার আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে দেশি কোম্পানিগুলোর (বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড, সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড) অংশিদারির প্রতিও জোর দেওয়া হয়েছে। '২০২৮ সালের মধ্যে বাপেক্স যাতে দেশের বাইরে জ্বালানি সন্ধানে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে' সে জন্য ২০১৯ সালের মধ্যে আইনি কাঠামো প্রস্তুতের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। গ্যাস খাতের উন্নয়নের জন্য গ্যাস ইফিশিয়েন্সি ৩৮% থেকে বাড়িয়ে ৪৫%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.২ লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস

নতুন মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস আমদানি করে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার ঘাটতি মেটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ধরা হয়েছে ২০১৯ সাল নাগাদ ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানি করে পুরো গ্যাসের চাহিদার ১৭% মেটানো হবে, ২০২৩ সাল নাগাদ তা বাড়িয়ে ৪০%, ২০১৮ সাল নাগাদ ৫০% এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৭০% চাহিদা মেটানো হবে। অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাসের বর্তমান মূল্যের চেয়ে দশ গুণ দামে এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরতা বাড়ানো হবে। এই উদ্দেশ্যে এলএনজি ল্যান্ড টার্মিনাল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ২০১৯ সালের মধ্যে জ্বালানি হিসেবে বর্তমান গ্যাস অবকাঠামো ব্যবহার করে এলএনজির প্রভাব বিবেচনা করে নতুনভাবে পরিকল্পনা করা হবে বলে উল্লেখ আছে। এর জন্য ২০১৮ সালের মধ্যে এলএনজি প্রকিউরমেন্ট স্ট্র্যাটেজি প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

২.৩ কয়লা

দেশীয় কয়লা উত্তোলনের জন্য নতুন মহাপরিকল্পনায় বড়পুকুরিয়ার পর দীঘিপাড়া ও খালাসপীরে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের অনুমতির ওপর জোর দিচ্ছে। ছোট আকারে ফুলবাড়ীতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশীয় কয়লা উৎপাদন ১.১ মিলিয়ন টন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫.৭ মিলিয়ন টন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১১.২ মিলিয়ন টন দীঘিপাড়া, খালাসপীর ও ফুলবাড়ী থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কয়লা আমদানির জন্য মাতারবাড়ীতে কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল প্রথম ধাপে অপারেশন শুরু করবে এবং দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে ২০২৯ সালের মধ্যে। ভবিষ্যতে কয়লা আমদানির জন্য নির্মিতব্য অবকাঠামো উন্নয়নে সমুদ্রপথে কয়লা পরিবহনের ও খালাসের জন্য ভাসমান ক্রেন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৪ তেল ও লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস

তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের তেল পরিশোধনের সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তবে ২০১৭ সালের মধ্যে তেল আমদানিতে যাতে কোনো ভর্তুকি দিতে না হয় সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস যদিও বর্তমানে আমাদের মোট জ্বালানি চাহিদার মাত্র ০.০১% মেটায়, ধরে নেওয়া হচ্ছে এর চাহিদা দিনে দিনে আরো বাড়বে। গৃহস্থালির রান্নার কাজে এলপিজিকে একটি স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসাবে হাজির করা হলেও বর্তমানে এলপিজির মূল্য পাইপলাইনে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যের দুই থেকে তিন গুণ হওয়ায় ভর্তুকি প্রদান না করলে এই জ্বালানি নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে রয়ে যাবে। ২০১৬ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী এলপিজি ব্যবহারে ভর্তুকি দেওয়া তেল ক্রয়ে ভর্তুকি দেওয়ার মতোই নিরুৎসাহ করা হয়েছে।

২.৫ হাইড্রো পাওয়ার

এই মহাপরিকল্পনায় পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্লান্ট, অর্ডিনারি হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট এবং ক্ষুদ্র পাওয়ার প্লান্টের কথা বলা হয়েছে। পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্লান্ট ও অর্ডিনারি হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টের জন্য সম্ভাব্য জায়গা বাছাই করা হলেও পূর্বের কাপ্তাই প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে, এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং প্রজেক্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির দিক বিবেচনা করে।

> বিদ্যুৎ খাতে দ্বিতীয় সংস্কারটি হয় বিশ্বব্যাংকের এনার্জি সেক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট প্রগ্রামের আওতায় ঋণ নেওয়ার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে। ১৯৮৭ সালে বিশ্বব্যাংক পিডিবির বিতরণ কার্য বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৯০ সালে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার ওপর ট্রান্সমিশন ও বিতরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

২.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নতুন মহাপরিকল্পনা নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ২ হাজার ৪৭০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৩ হাজার ৮৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এ ছাড়া গৃহস্থালি পর্যায়ে প্রতিদিন ৭ লাখ ৯০ হাজার কিউবিক মিটার বায়োগ্যাস, ২০৩১ সালের মধ্যে প্রতিদিন আরো ৬ লাখ কিউবিক মিটার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রতিদিন আরো ত্রিশ লাখ কিউবিক মিটার বায়োগ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

২.৭ বিদ্যুৎ আমদানি

মহাপরিকল্পনায় ধরে নেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য উত্তর দিকে নেপালের হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট, ভুটানের কুরি হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট এবং অরুণাচলের হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট হতে পারে বিদ্যুৎ আমদানির উৎস। ভুটান ও নেপাল থেকে বাংলাদেশকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে হলে ভারতের ভেতর দিয়ে আনতে হলে সে ক্ষেত্রে তিনটি লাইনের কথা মহাপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো শিলচর-মেঘনাঘাট/ভুলতা-বাহরামপুর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪০০ কেভি সংযোগ, দ্বিতীয়টি রাঙ্গিয়া/রওতা (আসাম) থেকে বাংলাদেশের জামালপুর বা বড়পুকুরিয়া হয়ে ভারতের মুজাফফরনগর পর্যন্ত ৮০০ কেভি এইচভিডিসি ৬ হাজার মেগাওয়াট বাইপোল লাইন, এবং তৃতীয়টি হলো আসামের বঙ্গাইগাঁও থেকে জামালপুর বা বড়পুকুরিয়া হয়ে ভারতের পুর্ণিয়া পর্যন্ত ৭৬৫ কেভি এইচভিএসি লাইন। এ ছাড়া

মেঘালয় রাজ্যের পাম্পড স্টোরেজ হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি করা যেতে পারে বলে উল্লেখ আছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই লাইনগুলো দিয়ে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট ও সর্বনিম্ন ৩ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট ও সর্বনিম্ন ৫ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩৫ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট ও সর্বনিম্ন ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা যেতে পারে বলে হিসাব করা হয়েছে।

২.৮ বিদ্যুৎ উন্নয়ন

নতুন মহাপরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উপায় অবলম্বনের উল্লেখ রয়েছে– ১. লোডশেডিং বন্ধ করা, ২. উচ্চমূল্যে রেন্টাল পাওয়ার থেকে বের হয়ে আসা, ৩. স্বল্পমূল্যে যোগানের জন্য বেসলোড নিশ্চিত করা, ৪. সমন্বয়পূর্ণ জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং ৫. জ্বালানি মিশ্রণ এমনভাবে বিন্যাস করা, যাতে তা অর্থনীতি, পরিবেশ, জ্বালানি– এই তিনটি দিককে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।

৩. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও 'নব্য উদারতাবাদ'

নব্য উদারতাবাদ নীতি হচ্ছে সেই সব অর্থনৈতিক নীতি, যা জনগণের সম্পদ ও তা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য দেশে যে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব সীমিত করে ব্যক্তি খাতকে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সরকারসহ 'মুক্তবাজার' অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রবক্তারা উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় 'সরকারের সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং অকার্যকর' এই অজুহাত দেখিয়ে ব্যক্তিপুঁজি মুখি নীতি গ্রহণ সংকট সমাধানের পথ হিসেবে দেখিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতাই যে কোনো সংকটকে সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে এবং এ জন্য ব্যক্তি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যাঁরা এই দর্শনের অনুসারী তাঁরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সংকটের কারণ মনে করেন এবং মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তি খাতে উৎপাদন, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ দিয়ে দিলে সংকটের অবসান হবে বলে মনে করেন। আবার নব্য উদারতাবাদের সমালোচকরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে অধিক জোর আরোপ করেন এবং ব্যক্তি খাতে দেশীয় জ্বালানি ও বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণ দেওয়াকে জনস্বার্থবিরোধী মনে করেন। তাঁদের মতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মুনাফাকে জনগণের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে জনস্বার্থের নামে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারে অধিক সচেষ্ট থাকে। এই খাতে বিদেশি কোম্পানিগুলোও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অসম চুক্তির মাধ্যমে অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই ধরনের নীতি অনুসরণের ফলে যোগান ও দামের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, জনগণের ভোগান্তি বাড়ে এবং দেশীয় সম্পদ ব্যবহারে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়।

যদিও বাংলাদেশে এখনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয়, কিন্তু বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি, জ্বালানি উত্তোলনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অগ্রসর না হওয়া, ঋণদাতা সংস্থাগুলোর শর্ত পূরণে বাধ্যবাধকতাকে গুরুত্ব দেওয়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণের দিকে ঝুঁকে যাওয়া– এই সব নীতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে যেসব সংস্কার আনার মাধ্যমে এই খাতগুলো স্বাধীনতার পর থেকে কার্যত মুনাফাকেন্দ্রিক তৎপরতার অধীনস্ত করা হয়েচে, ধারাবাহিকভাবে সেই সব সংস্কারের বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

৩.১ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার : উৎপাদন, ট্রান্সমিশন, বিতরণ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হলো বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি)। ১৯৭৭ সালে এর প্রথম সংস্কার করা হয় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বা রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি) এবং কো-অপারেটিভ মডেল অনুসরণ করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড শহর অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পড়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ডের ওপর। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দায়িত্ব হলো গ্রাম পর্যায়ে সদস্যদের মাধ্যমে সমিতি করে পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ খাতে দ্বিতীয় সংস্কারটি হয় বিশ্বব্যাংকের এনার্জি সেক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট প্রোগ্রামের আওতায় ঋণ নেওয়ার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে। ১৯৮৭ সালে বিশ্বব্যাংক পিডিবির বিতরণ কার্য বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৯০ সালে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার ওপর ট্রান্সমিশন ও বিতরণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

> এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজনে বিশ্বব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আয়োজন করা এই বৈঠকে তারা সেখানে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, পরামর্শকদের নিয়ে আসে আর সেখানেই পরামর্শ দেওয়া হয় বাংলাদেশের গ্যাস খাতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করতে।

১৯৯০-এর দশকে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি প্রকট হওয়ার কারণ দেখিয়ে ক্যাবিনেট আরেকটি সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়। আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি বিভিন্ন উন্নয়ন অংশিদারী প্রতিষ্ঠান এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) পরামর্শ অনুযায়ী আরো একটি বিদ্যুৎ খাত সংস্কার শুরু করে। এই সংস্কার পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম ইন বাংলাদেশ (পিএসআরবি) নামে অধিক পরিচিত। ১৯৯৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্কারের আওতায় যে সংস্কারগুলো সাধন করা হয় তা হলো– ১. পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ট্রান্সমিশনকে উৎপাদন ও বিতরণ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। ২. ডেসাকে ভাগ করে ডেসকো নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঢাকার আংশিক বিতরণের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। ৩. প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি তৈরি করে বেসরকারি উদ্যোগে স্বাধীন পাওয়ার প্লান্টকে (আইপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংক জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র পাওয়ার সেল গঠন করার জন্য অর্থায়ন করে। এই পাওয়ার সেলের পরবর্তী উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ১৯৯৬ সালে সরকারের একটি নীতি প্রণয়ন করা, যার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারে।

২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আরো কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সাধন করা হয়। এর মধ্যে আছে ভার্টিক্যাল আনবান্ডেলিং। ২০০০ সালে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করে ধীরে ধীরে যে সংস্কারগুলো সাধন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে– ১. ২০০১ সালে পশ্চিমের বিতরণের দায়িত্ব পিডিবি থেকে সরিয়ে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) ওপর ন্যস্ত করা হয়। ২. ২০০৬ সালে ডেসা থেকে অবশিষ্ট বিতরণের দায়িত্ব ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) ওপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে ডেসাই ডিপিডিসি হিসেবে পরিচিত। এই সংস্কারের মাধ্যমে পিডিবি পরিণত হয়েছে একমাত্র বিদ্যুৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানে, যা সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত সব বিদ্যুৎ কেনে এবং তা বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে।

২০০৪ সালে 'প্রাইভেট সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার গাইডলাইনস', ২০০৭ সালে 'পলিসি গাইডলাইনস ফর পাওয়ার পারচেস ফ্রম ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট', ২০০৮ সালে 'পলিসি গাইডলাইনস ফর এনহ্যান্সমেন্ট অব প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন পাওয়ার সেক্টর' তৈরি করা হয়, যেগুলো মূলত ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে, দ্রুতগতিতে ছোট পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে সমাধান আনতে এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কিনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে আমরা দেখি, ২০০৯ সালে সরকারি- বেসরকারি অংশিদারির মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সরকার উচ্চমূল্যে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। টেন্ডার ছাড়া বেসরকারি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরকারকে প্রচুর ভর্তুকি দিতে হয়েছে এবং বিদ্যুতের দামও বাড়াতে হয়েছে। সম্প্রতি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সাথে সরকার চুক্তি নবায়ন করে এর মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি প্রথম থেকেই সরকার দ্বারা খুব একটা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে পিডিবি, আরইবি এবং লোকাল গভর্নমেন্ট বিভাগ যুক্ত থাকলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি মূলত বেসরকারি ও এনজিও উদ্যোগেই বেশি অগ্রসর হয়েছে। ১৯৯৭ সালে বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ইডকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইডকল প্রথম থেকেই বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবি ও পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের অধীনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য স্বাধীন বিভাগও খোলা হয়। তবে এখন পর্যন্ত সরকারের উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাফল্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। (Sultana 2016)

> বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন একটি কমিশন হিসেবে মূল্য নিয়ন্ত্রণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, নামে মাত্র এই কমিশন ভোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে, শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে অযৌক্তিকভাবে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

৩.২ জ্বালানি খাত সংস্কার : উত্তোলন, উৎপাদন ও বিতরণ

১৯৯৮ সালে 'এনার্জি ও মিনারেল রিসোর্স ডিভিশন (ইএমআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত এই বিভাগটির ওপর 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ', 'পেট্রোবাংলা', 'ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভের' ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। ইএমআরডি হাইড্রোকার্বন ইউনিট এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটও দেখাশোনা করে।

১৯৭২ সালে পেট্রোবাংলা বা বাংলাদেশ অয়েল গ্যাস অ্যান্ড মিনারেল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে তেল-গ্যাস উন্নয়ন নিয়ে ১৯৬১ সাল থেকে কাজ করছিল অয়েল গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ওজিসিডি)। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়, যাতে পেট্রোবাংলা প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বিদেশি তেল কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জ্বালানি উত্তোলন করতে পারে। পেট্রোবাংলার কাজ হচ্ছে– ১. গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও উন্নয়ন, ২. জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে সমন্বয় সাধন করা, ৩. প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তি করে গ্যাস উত্তোলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

একটি সংস্কারের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রমকে ট্রান্সমিশন ও বিতরণ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। এর ফলে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৯৮৭ সালে ট্রান্সমিশন আলাদা করে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৭৭ সালে জ্বালানি আমদানি, মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অধীনে ৫টি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো তেল পরিশোধন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণের কাজ করে থাকে। এগুলো হলো ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিপিসি বিদেশ থেকে তেল ক্রয় থেকে বাজারজাতকরণ–প্রতিটি কাজ করত এবং সরকার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হতো। সম্প্রতি বাজার উদারীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার বিপিসির মাধ্যমে তেল ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা শিথিল করে দিয়েছে। এতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা এখন বিদেশ থেকে সরাসরি তেল ক্রয় করার অনুমতি অর্জন করেছে। ফলে তেল ক্রয়ের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমে যাচ্ছে। (Sultana 2016)

৪. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত পরিকল্পনার রাজনৈতিক অর্থনীতি (১৯৭১-২০১৬)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে অনেক নীতি, পরিকল্পনা, অ্যাক্ট, গাইডলাইন ও চুক্তি হয়েছে। তবে স্বাধীনতার ২৫ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম জ্বালানিনীতি অনুমোদন করা হয়েছে এবং সংশোধন করা হয়েছে ২০০৫ সালে। আরো কিছু নীতি, যেমন–'পেট্রোলিয়াম পলিসি ১৯৯৩', 'প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি ১৯৯৬', 'নবায়নযোগ্য জ্বালানিনীতি

২০০৮' এবং 'কয়লানীতি ২০১০' করা হয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন সময় বিদেশি সংস্থার সাথে পরামর্শ করে কিছু পরিকল্পনা, রূপকল্প, নির্দেশনা ও মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মধ্যে সমন্বয় করে কোনো সমন্বিত নীতি প্রস্তুত করা হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি চাহিদা মেটানোকে লক্ষ্য রেখেই নিয়মনীতি, নির্দেশনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে বিদেশি ঋণ নিয়ে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রথম পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। আর এর ঠিক পরেই বিদেশি তেল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কূপ খনন করে জ্বালানি অনুসন্ধান শুরু করে। তখনো বাংলাদেশ নিজস্ব জ্বালানি উত্তোলন বা ব্যবহারের ব্যাপারে কোনো নীতি বা নির্দেশনা জারি করেনি। অর্থাৎ জরিপ, উত্তোলন, উৎপাদন সম্পূর্ণ নীতিনির্ধারন ছাড়াই অগ্রসর হচ্ছিল। তবে তখন থেকেই সরকার বুঝতে পারছিল যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে জনবল তৈরির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান জরুরি ছিল। এর ফলে সরকারের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে প্রথম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জ্বালানি খাত উন্নয়নের জন্য প্রথমে জনবল প্রস্তুত করা। ১৯৮০-র দশকে কোনো জ্বালানিনীতি প্রণয়ন ছাড়াই বাংলাদেশ শেল অয়েল ও সিমিটার এক্সপ্লোরেশনের সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট করে তাদের গ্যাস/তেল উত্তোলনের সুযোগ করে দেয়। সামরিক শাসক এরশাদ আমলেই এই উদ্যোগগুলো শুরু হয়।

প্রায় ১৫ বছর অগণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা শাসিত হয়ে ১৯৯০-এ প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে যখন গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হয় তখন জ্বালানিনীতি প্রণয়নের কাজটি শুরু হয়। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী তখন সরকার বিদেশি কোম্পানির দ্বারা জ্বালানি উত্তোলনের জন্য চুক্তি উন্নয়নের ওপর জোর দিতে গিয়ে জ্বালানিনীতি তৈরির আগেই ১৯৯৩ সালে পেট্রোলিয়ামনীতি প্রণয়ন করে। এর ঠিক পরপরই পেট্রোবাংলা আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজনে বিশ্বব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আয়োজন করা এই বৈঠকে তারা সেখানে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, পরামর্শকদের নিয়ে আসে আর সেখানেই পরামর্শ দেওয়া হয় বাংলাদেশের গ্যাস খাতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করতে। পেট্রোলিয়ামনীতি (১৯৯৩) প্রণয়নের পর আর জ্বালানিনীতি (১৯৯৬) তৈরির মাঝে তিন বছরে বাংলাদেশ চারটি পিএসসি স্বাক্ষর করে ক্লেইর্ন এনার্জি, হল্যান্ড সি সার্চ, অক্সিডেন্টাল ও মেরিডিয়ানের সাথে। পরে ১৯৯৬ সালে যে জাতীয় জ্বালানিনীতি অনুমোদন দেওয়া হয়, সেখানেও সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। এই জ্বালানিনীতি তৈরির পুরো প্রক্রিয়ার ওপর বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রভাব ছিল। বিদেশি পুঁজির পথ উন্মুক্ত করা এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে অধিক জোর দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিদেশি সংস্থাগুলোর স্বার্থ উদ্ধারের পথ সুগম হয় তখনই।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট যখন ক্ষমতায়, তখন ১৯৯৪ সাল থেকে জ্বালানি খাতের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতেও কিছু নব্য উদারতাবাদী সংস্কার শুরু হয়। এই সংস্কারগুলো, যেমন–পাওয়ার সেল গঠন, উৎপাদন, ট্রান্সমিশন, বিতরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এই প্রবন্ধে আগেই তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি সংস্কারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ঋণ অর্থায়ন ও টেকনিক্যাল সমর্থন দিয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। ১৯৯৬ সালে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি প্রণয়নের পেছনে উদ্দেশ্যই ছিল বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ট্যাক্স মওকুফ, বিদেশি কোম্পানি ও পরামর্শকদের আয়কর মওকুফের মতো প্রণোদনা বাস্তবায়ন করা। এই নীতি ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে টেকনিক্যাল সহায়তা ও অর্থ নিতে উৎসাহিত করেছে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে রাজনৈতিক জোট ক্ষমতায় ছিল। এই সময়ে ১৯৯৭ সালে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টে নতুন কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৯৭ সালের পর থেকে পেট্রোবাংলা বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করার পাশাপাশি কোম্পানিগুলো বাপেক্সকে নামমাত্র অংশিদারি দেওয়া শুরু করে। কিন্তু এর ফলে আদতে বাপেক্স কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা লাভ করেছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। কারণ নাইকোর সাথে বাপেক্সের চুক্তিও হয়েছিল যৌথ অংশিদারিতে। কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখেছি, টেংরাটিলা বিস্ফোরণের পরও নাইকো কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে চলে গেছে এবং বাপেক্স সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদানই রাখতে পারেনি। ১৯৯৮ সালে বেসরকারি উদ্যোগে ছোট ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়। এর নাম ছিল 'পলিসি গাইডলাইন ফর স্মল পাওয়ার প্লান্ট ইন প্রাইভেট সেক্টর', যার মধ্যে ২০০৮ সালে আরো সংযোজন-বিয়োজন করা হয়। এই গাইডলাইনের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত কার্যকর করা যায় এমন ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র কিভাবে চালু করা যায় তার একটি নির্দেশনা দেওয়া। ১৯৯৮ সালে মেঘনাঘাট ও হরিপুর প্রজেক্টের সাথে আইপিপি (Independent Power Plant) চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৯৯৯ সালে টেকনোলজি ট্রান্সফার ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে হাইড্রোকার্বন ইউনিট গঠন করা হয়। নরওয়ে সরকার প্রথম দিকে প্রজেক্টটির অর্থায়ন করলেও পরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ঋণ সহায়তা দেওয়া শুরু করে। ওই সময়ই ক্রস বর্ডার বিদ্যুৎ আন্তসংযোগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং ২০০০ সালে ইউএসএআইডি নিজ অর্থায়নে চারটি লাইনে একটি প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৯৯৬ সালে সরকারের ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্বালানি বা বিদ্যুৎ খাতের নীতিগত ও কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এমনকি পরবর্তী নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার যখন বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি রূপকল্প তৈরি করে, সেখানেও বিদ্যুৎ খাত প্রসারণের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়।

২০০১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি যখন পুনরায় ক্ষমতায় আসে, তখনো সারা বিশ্বে যে নব্য উদারবাদী সংস্কার চলতে থাকে তার হাওয়া বাংলাদেশে আরও প্রবলভাবে বইতে থাকে। ২০০৩ সালে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন অ্যাক্ট (BERC Act ২০০৩) তৈরি করা হয় এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কাজ শুরু করে। ওই সময় বিশ্বের বহু দেশে যেখানে বিদ্যুৎ খাত বেসরকারীকরণ শুরু হয়, সেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুতের মূল্য বাড়ায় জনগণ ভোগান্তির শিকার হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু বেসরকারীকরণ থেকে

> বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অনিয়ন্ত্রিতভাবে সুবিধা দিতে গিয়ে সরকার ভোক্তাদের বেশি দামে কিনতে বাধ্য করছে। অন্যদিকে এলপি গ্যাসের দাম প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় বেশি বলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলছে।

পিছিয়ে আসা নব্য উদারীকরণ নীতির পরিপন্থী, তাই এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরনের রেগুলেটরি নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করে মূল্য নির্ধারণ করা। অর্থাৎ এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণকে অরাজনৈতিকীকরণই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন একটি কমিশন হিসেবে মূল্য নিয়ন্ত্রণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, নামে মাত্র এই কমিশন ভোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে অযৌক্তিকভাবে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। এই সরকারের আমলেই ২০০৪ সালে জাতীয় জ্বালানিনীতি অনুমোদন হয়, গ্যাস সেক্টর রিফর্ম রোডম্যাপ (জিএসআরআর) অনুমোদিত হয়, পিজিসিবি কর্পোরেট বন্ড ইস্যু অনুমোদন করে অর্থায়ন শুরু হয় এবং বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের জন্য পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। গ্যাস সেক্টর রিফর্ম রোডম্যাপে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের আংশিক অংশিদারি বেসরকারি খাতে দিয়ে এর পরিচালনা, উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়।

> একদিক থেকে গ্যাসের সংকট দেখিয়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে এলপি গ্যাসের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখছে সরকার, অন্যদিকে সমুদ্রবক্ষে গ্যাস উত্তোলনের সক্ষমতা নেই দাবি করে ভবিষ্যৎ গ্যাস সংকটের অজুহাত দেখিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

২০০৫ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়। ২০০৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের জন্য বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়। এই মহাপরিকল্পনায় দেখানো হয়, ফুলবাড়ী থেকে উত্তোলিত কয়লা বিদেশি কয়লা, এমনকি বড়পুকুরিয়ার কয়লা থেকেও কম দামে সরবরাহ করা সম্ভব। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে ফুলবাড়ীর কয়লার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়ার সময় সরকার নিজস্ব কোনো নিরপেক্ষ তথ্য ব্যবহার না করে এশিয়া এনার্জির দেওয়া তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে প্রকল্পকে গ্রহণযোগ্য করবার উদ্দেশ্যে উত্তোলিত কয়লাকে সস্তা হিসেবে জনগণের সামনে হাজির করে। বিএনপি জোট সরকারের ক্ষমতার শেষের দিকে নতুন করে আরেকটি পাওয়ার ট্রান্সমিশন ইন্টারকানেকশন নিয়ে প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়। ২০০৬ সালে ইউএসএআইডি ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-শ্রীলঙ্কার ওপর এই গবেষণাটি সম্পন্ন করে।

২০০৬-০৮ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালে তিনটি পলিসি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়– ১. 'পলিসি গাইডলাইন ফর পাওয়ার পারচেজ ফ্রম ক্যাপটিভ পাওয়ার ২০০৭', ২. 'রিমোট এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই গাইডলাইন ২০০৭' এবং ৩. 'পলিসি গাইডলাইন ফর এনহ্যান্সমেন্ট ফর প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন পাওয়ার সেক্টর ২০০৮'। এই সময়ে এনডাব্লিউজেডপিজিসি কর্পোরেটাইজ করা হয়, তিন বছরের জন্য একটি পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম রোডম্যাপ (২০০৮-১১) তৈরি করা হয় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিনীতি প্রস্তুত করা হয়। এই সময় উত্তোলনকারী কোম্পানির দ্বারা গ্যাস রপ্তানির বিধান রেখে মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (Model PSC ২০০৮) তৈরি করা হয়, যা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে পরবর্তীতে নতুন মডেল পিএসসি ২০১২-তে রপ্তানির সুযোগ বাদ দেওয়া হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে নির্বাচনে জয়লাভের পর বিদ্যুৎ খাতে কয়েকটি পরিবর্তন নিয়ে আসে– ১. রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার ছাড়াই দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে নেমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ নিয়ে যাতে কোনো প্রশ্ন না থাকে সে জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আইন, ২০১০ বা Speed Supply of Power and Energy (Special Provision) Act, 2010 প্রণয়ন করে ২. গ্যাস সেক্টর নীতিতে পরিবর্তন এনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সাথে সমুদ্র ব্লকগুলোতে দ্রুত চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, ৩. সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার Santos-Krish Energy, ভারতের ওএনজিসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনোকো-ফিলিপসের সাথে তিনটি পিএসসি চুক্তি সম্পন্ন করে, ৪. গ্যাস উন্নয়ন ফান্ড তৈরি করে দেশীয় গ্যাস কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়, ৫. পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান ২০১০ তৈরি করে, ৬. টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (SREDA) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে কাজ শুরু করার ক্ষেত্র তৈরি করে, ৭. ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করে, ৮. রাশিয়ার সাথে ২০১৮ সালের মধ্যে ২৪০০ হাজার মেগাওয়াট রূপপুর নিউক্লিয়ার প্লান্ট নির্মাণের চুক্তি করে, ৯. এলপি গ্যাস আমদানি করে তা গৃহস্থালি ও হোটেলে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়, ১০. রামপালে ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল প্লান্ট ও বাংলাদেশের পিডিবি যৌথ মালিকানায় প্রথম কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি করে, ১১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ শীর্ষক বিশেষ আইনটির মেয়াদ দুই দফায় সংশোধনের মাধ্যমে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এ আইনের আওতায় অনেকগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও তেল-গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়ার কারণে বর্তমান সরকার জনগণের তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহিত করে মোটা অঙ্কের ভর্তুকি দিয়ে। কুইক রেন্টাল ও রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টগুলোকে দায়মুক্তি আইনের আওতায় এনে তাদের মুনাফা করার পথ সুগম করে সরকার সমালোচিত হয়। নির্মিতব্য রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই সংশয় তৈরি হয়ে আছে। সুন্দরবনের ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়েছে, যার দরুন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ সরকার গৃহস্থালি, হোটেল-রেস্টুরেন্টে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে সিলিন্ডারজাত লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলপি গ্যাস ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অনিয়ন্ত্রিতভাবে সুবিধা দিতে গিয়ে সরকার ভোক্তাদের বেশি দামে কিনতে বাধ্য করছে। অন্যদিকে এলপি গ্যাসের দাম প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় বেশি বলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে কোম্পানিগুলো প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম দ্বিগুণ প্রস্তাব দিয়েছে, যা এখনো বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি

কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে। বর্তমানে এলপিজির চাহিদা প্রায় ৪ লাখ মেট্রিক টন। এই চাহিদার বিপরীতে দেশে সরকারিভাবে কমবেশি ২০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। আর বেসরকারিভাবে সরবরাহ করা হয় ১ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন (৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ইত্তেফাক)। বেসরকারি কোম্পানিগুলো আমদানির মাধ্যমে এলপিজি সরবরাহ করে। দেশে ৪৪টি বেসরকারি কোম্পানির বর্তমানে এলপিজি সরবরাহের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে বাজারের সিংহভাগ দখলে রয়েছে ওমেরা, বসুন্ধরা, পেট্রোগ্যাস, ৬ ইনডেক্স, যমুনা, টোটাল গ্যাস, সামিট, বাংলাদেশ অক্সিজেনসহ কয়েকটি কোম্পানির। তবে কয়েকটি বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারিভাবে প্রতিবছর আমদানি বাড়লেও ঘাটতি দূর হচ্ছে না। আর এই ঘাটতির সুযোগ নিচ্ছে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। ৭০০ টাকার সরকারি এলপিজি বিক্রি হচ্ছে ১২০০ থেকে ১৬০০ টাকায়। আর ১২০০ টাকার বেসরকারি এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে ১৩০০ থেকে ১৬০০ টাকায়। আবার একই মাপের সিলিন্ডার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। মূলত চাহিদামতো ও নির্ধারিত সময়ে এলপিজির বোতল না পাওয়ায় বিক্রেতার কাছ থেকে বেশি দামে সিলিন্ডার কিনতে বাধ্য হচ্ছে সাধারণ ক্রেতারা। আবার দেশে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) সিলিন্ডার ও ট্যাংকার উৎপাদনে নতুন বিনিয়োগ আসছে। বিভিন্ন খাতের ১৬টি কোম্পানি মিলে এ জন্য 'স্টার কনসোর্টিয়াম লিমিডেট' নামের একটি কনসোর্টিয়াম বা জোট গঠন করেছে। প্রাথমিকভাবে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার বা প্রায় ৯৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সিলিন্ডার ও ট্যাংকার উৎপাদনের কারখানা করবে এই জোট। তারা এলপিজি সিলিন্ডার ও ট্যাংকার নির্মাণে সহায়তা নেওয়ার জন্য ইরানের সারভি গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি করেছে। ভবিষ্যতে দেশে ৬০টি কোম্পানি এলপি গ্যাস সরবরাহ করবে। জোটটি সরবরাহ করবে সিলিন্ডার ও ট্যাংকার। কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা হলো পেডরোলো এনকে হোল্ডিংস, ক্রাউন গ্রুপ অ্যান্ড জিপিএইচ ইস্পাত, ইউনিক-বোরাক গ্রুপ, নিটল-নিলয় গ্রুপ, ক্রাউন স্টিল, ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন, ক্যাথারিস ডেভেলপমেন্ট, ইনসেপ্টা ফার্মা, মহসিন টি হোল্ডিংস, উইলশেয়ার, ইলেকট্রো মার্ট, রেস ম্যানেজমেন্ট, সাদ মূসা গ্রুপ, দাতো এবিডি নূর হোল্ডিংস এসডিএন বিএইচডি ও জাপান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১৬)। এলপি গ্যাসের এই বাণিজ্যিকীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সরকার। এলপি গ্যাসের উচ্চ বাজারমূল্য ও গ্যাস সংকট দেখিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য প্রথমবার এক দফা বৃদ্ধির পর ২০১৬ সালে পুনরায় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বিবেচনাধীন। এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভোক্তা পর্যায়ে তীব্র অসন্তোষ কাজ করছে।

এ ছাড়া এই সরকারের সময় জাপানের অর্থায়নে কক্সবাজারে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়ে প্রস্তাব জমা দিয়েছে জাপানের দুটি কোম্পানি–সুমিতোমো কর্পোরেশন ও মারুবেনি কর্পোরেশন, যা এখনো যাচাই করা হয়নি। মহেশখালীর মাতারবাড়ী এলাকায় এই বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আমদানি করা হবে। আমদানীকৃত কয়লা ওঠানো-নামানোর জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাথেই একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের বিষয়টিও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পের কার্যপত্রে বলা হয়েছে, জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এই প্রকল্পে ২৯ হাজার কোটি টাকা দেবে। ইতোমধ্যে মাতারবাড়ী প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকার। এদিকে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপের সাথে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ৭০ শতাংশের মালিকানা থাকবে এস আলম গ্রুপের ছয়টি কোম্পানির হাতে, বাকি ৩০ শতাংশের মালিকানা থাকবে চীনের সেপকো ইলেকট্রিক পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ও এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের। বাঁশখালীবাসী এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় চারজন প্রতিবাদী গ্রামবাসী নিহত হন, এরপরও রাষ্ট্রীয় নির্দেশে পুলিশ এই এলাকার বাসিন্দাদের অবরোধ করে রাখে এবং আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে রামপাল আন্দোলনের পর বাঁশখালীর জনগণের আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব নিয়ে জনগণের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। উল্লেখ্য, মাতারবাড়ীতেও ঠিক একইভাবে জনগণকে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল। সবগুলো ক্ষেত্রেই অস্বচ্ছতা, অনিয়ম ও দমনপীড়ন দেখা যাচ্ছে।

> ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে, সরকার মহাপরিকল্পনায় যে বিদ্যুৎ আমদানির কথা উল্লেখ করছে, তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে, নব্বইয়ের দশকে ইউএসএআইডির উদ্যোগে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি এই সরকার জ্বালানি খাতেও বেশ কিছু বিতর্কিত উদ্যোগ নিয়েছে। কুমিল্লার শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের ৪ নম্বর কূপ খননের জন্য ২০১৩ সালে ৬৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) জমা দেয় বাপেক্স। একই কূপ খননের জন্য ২৫০ কোটি ৭৩ লাখ টাকার প্রস্তাব দেয় রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম। বাপেক্সের প্রস্তাবের চেয়ে তিন গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওই দামেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানটিকে কাজ দেওয়া হয়। সম্প্রতি ভোলা জেলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের দুটি কূপ খননের কাজও বিদেশি এই কোম্পানি পাচ্ছে বলে জানা গেছে। বাপেক্স কর্তৃক প্রতিটি কূপ খননের ব্যয় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নসহ ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা। ভাড়াকৃত রিগের মাধ্যমে খনন করলে ব্যয় হয় ১০০ থেকে ১১০ কোটি টাকা। অন্যদিকে গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে খনন করলে প্রতিটি কূপে ব্যয় হবে ২৫০ কোটি টাকার বেশি (বণিক বার্তা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

সমুদ্রবক্ষে গ্যাস উত্তোলন নিয়েও সরকার রপ্তানির বিধান রেখে পিএসসি স্বাক্ষর করে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জনস্বার্থবিরোধী উদ্যোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় সমঝোতার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রের ১২ নম্বর ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ পাচ্ছে দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি পোসকো দাইউ কর্পোরেশন। একদিক থেকে গ্যাসের সংকট দেখিয়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে এলপি গ্যাসের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখছে সরকার, অন্যদিকে সমুদ্রবক্ষে গ্যাস উত্তোলনের সক্ষমতা নেই দাবি করে ভবিষ্যৎ গ্যাস সংকটের অজুহাত দেখিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে

অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। সমুদ্রবক্ষে গ্যাস উত্তোলন নিয়ে যে বাণিজ্য শুরু হলো, তার প্রথম উদাহরণ এই ১২ নম্বর ব্লক।

৫. উপসংহার

এটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত যেসব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তার সবই কোনো না কোনো বৈদেশিক ঋণ ও কারিগরি সহায়তা নিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ অথবা ঋণদাতা সংস্থার কারিগরি ও পরামর্শ সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই কয়লার উদাহরণ চলে আসে। কয়লার ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর যে পরিকল্পনা সরকার করে আসছে, তার পেছনে সব সময়ই বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ ছিল। ফুলবাড়ীর ক্ষেত্রে দেখেছি, এশিয়া এনার্জি বা ভারতের টাটা কোম্পানির স্বার্থ নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। অসম ভাগাভাগির শর্ত আরোপ করে গ্যাস রপ্তানির বিধান রেখে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট করার মাধ্যমে স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উত্তোলনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে। ২০১২ সালে মডেল পিএসসিতে রপ্তানি করার সুযোগ রাখা না হলেও দ্রুত জ্বালানি আইন, ২০১০ এর অধীনে সম্প্রতি কোরিয়ার পোসকো দাইউ কোম্পানির সাথে রপ্তানির সুযোগ রেখে সমুদ্র গ্যাস ব্লক থেকে গ্যাস সন্ধানের চুক্তি করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সরকার একদিক থেকে যখন দাবি করছে গ্যাসের সংকট বিরাজ করছে, অন্যদিক থেকে বিদেশি কোম্পানিকে রপ্তানি করার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে তার পরস্পরবিরোধী অবস্থানই সামনে আনছে। একইভাবে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এনটিপিসির স্বার্থ, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। গ্যাস খাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পেট্রোলিয়াম উত্তোলনকারী কোম্পানি বাপেক্স, সিলেট গ্যাস ফিল্ড এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড যেখানে মোট উৎপাদিত গ্যাসের ৪৫% উত্তোলন করে, সেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলো (শেভরন, সান্তোস, তাল্লো) উৎপাদন করে মোট গ্যাসের ৫৫%। এদিকে এলপি গ্যাসের বাজারে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের আমদানি করার অনুমতি দিয়ে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করে সরকার এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ তথা বিদেশি কোম্পানি থেকে ক্রয়কেই উৎসাহিত করছে। অন্যদিকে বাজার উদারীকরণের নামে এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির অব্যবস্থাপনার অজুহাত দেখিয়ে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি বিদেশ থেকে তেল ক্রয়ের অনুমতি দিয়ে এখানেও নিয়ন্ত্রণহীনতার ক্ষেত্র তৈরি করছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে সরকার মহাপরিকল্পনায় যে বিদ্যুৎ আমদানির কথা উল্লেখ করছে, তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে, নব্বইয়ের দশকে ইউএসএআইডির উদ্যোগে।

এই সব দিক পর্যালোচনা করলে দেখি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গত কয়েক দশক ধরেই বিভিন্ন সরকার একই ধারায় নব্য উদারতাবাদ নীতিকাঠামোতে অগ্রসর হয়েছে, এবং এখন তা আরও জোরদার হচ্ছে। যে নীতি কাঠামো দেশের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে আড়ালে বিদেশি শক্তির স্বার্থ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে এত দিন, দেশের জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ করার চেয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শে বেশি মূল্যে জনগণকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্রয়ে বাধ্য করেছে, দেশ ও পরিবেশ বিপন্ন করে দেশি বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার গতিপথ অনুসরণ করেছে তা অব্যাহত এবং আরও জোরদার করাই এই 'নতুন' মহাপরিকল্পনার সারকথা।

মোশাহিদা সুলতানা: সহকারী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইল : moshahida@gmail.com

তথ্যসূত্র

[সুলতানা] Sultana, M (2016) Power and Energy: Potential, Crisis, and Planning, in *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh,* Routledge Handbooks, New York.

[বাংলাদেশ সরকার] People's Republic of Bangladesh (2016) Survey on Power System Master Plan 2016 Draft Final Report, Japan International Cooperation Agency

[ইত্তেফাক] *ইত্তেফাক*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[প্রথম আলো] *প্রথম আলো*, ২৬ জুলাই ২০১৬
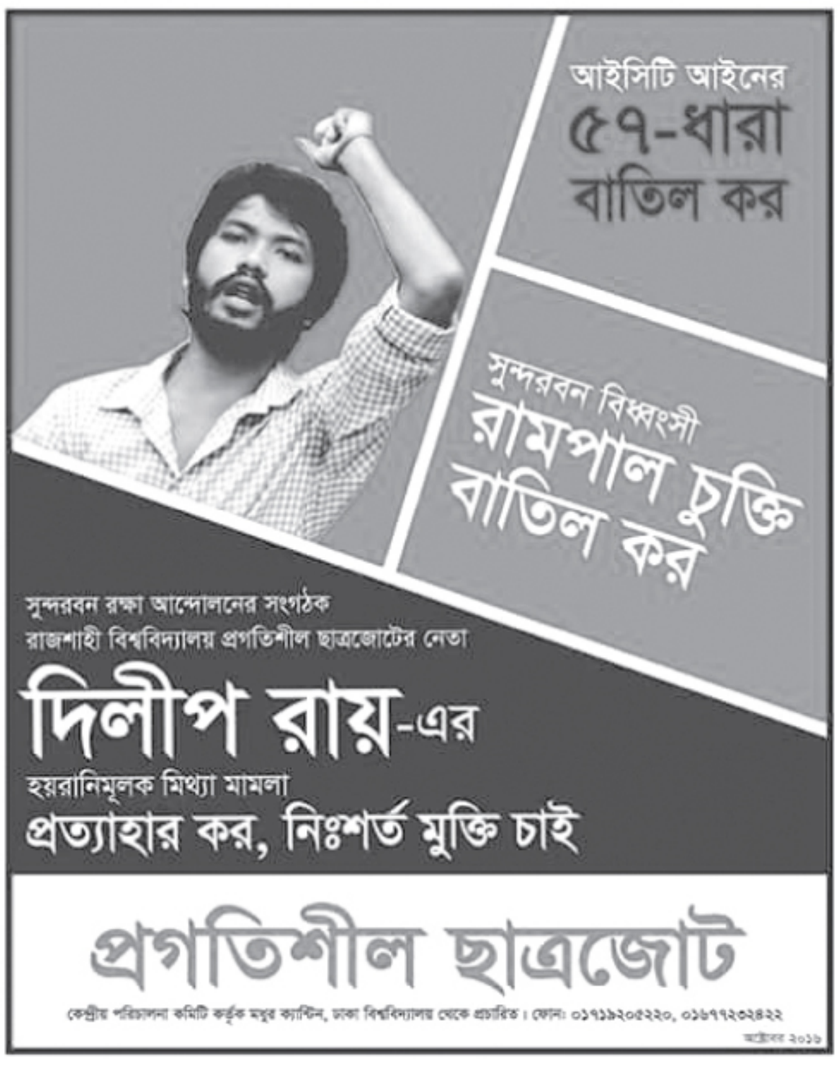
[বণিক বার্তা] *বণিক বার্তা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬